প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসা

কমল সরকার

অমর ভারতী
৮/সি ট্যামার লেন
কলিকাতা-৯

প্রাথমিক চিকিৎসা

বা

প্রাথমিক সেবা

ফাষ্ট এড

এতে আছে

চোখ

মানুষের চোখ অমূল্য সম্পদ। সামান্য গাফিলতিতে এ চোখ নষ্ট হয়ে গেলে পুরণ করা সম্ভবপর নয়। নানা কারণে চোখ দুর্ঘটনার কবলিত হতে পারে। চোখে ধুলো বালি পড়তে পারে, কাজ করবার সময় কিছু ছিট্‌কে এসে চোখে বিঁধতে পারে, ভুল করে ঔষধ চোখে লাগানো হতে পারে —এমনি কত রকমে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চোখে কিছু পড়লে ঃ

১। রোগীর চোখ কর কর করে।
২। জল পড়ে, লাল হয়ে উঠে।
৩। রোগী চোখ রগড়ায়।

কি করবেন ঃ

অতিরিক্ত ক্ষার, ঘন রিটের জল, সোডা ইত্যাদি লেগে চোখে তৎক্ষণাৎ প্রদাহের সৃষ্টি হয়। চোখ লাল হয়ে উঠে, ভীষণ জ্বালা করতে থাকে, জল পড়ে এবং চোখ খোলা যায় না বা খুলতে কষ্ট হয়।

(ক) পরিষ্কার জলে তৎক্ষণাৎ চোখ দুটি ধুয়ে ফেলুন।

(খ) এবার পরিষ্কার দুধ দিয়ে ধুতে থাকুন।

(গ) ডাক্তারের সাহায্য নিন।

কোন পদার্থ বা বস্তু গিলে ফেললে ঃ

অনেক বস্তু গিলে খেতে গিয়ে সেটা পাকস্থলীতে না গিয়ে গলায় আটকে থাকলে, শ্বাসরোধ হতে পারে।

এরূপ অবস্থায় রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে দিন, মুখ নীচু রাখুন, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করুন। যত

শীঘ্র সম্ভব মেডিক্যালের সাহায্য নিন। অচিরে ২।৩ মিনিটের মধ্যে মেডিক্যাল সাহায্যের সম্ভাবনা না থাকলে রোগীর শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলে ছোট কলম ছুরি দিয়ে ট্রেকিয়ারে ¼" ইঞ্চির মতো গভীর ছিদ্র করে দিন যাতে সাময়িক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে পারে।

পদার্থ বা বস্তু টি পাকস্থলিতে চলে গেলে ঃ

১। পদার্থটি মসৃণ এবং ছোট হলে, যথা—মুদ্রা, ফলের বিচি, বোতাম ইত্যাদি হলে তেমন ভয়ের কারণ নেই। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অবশ্য একথা জানা থকেলে ও মেডিক্যাল সাহায্য নেবেন।

২। পদার্থ বা বস্তু টি বড়ো অথবা তীক্ষ্ম ধারালো বা সূঁচালো জাতীয় হলে, রোগীকে মুখ দিয়ে কিছু খেতে দিবেন না এবং যত শীঘ্র সম্ভব মেডিক্যাল সাহায্য নেবেন।

নাকে কিছু ঢুকে গেলে ঃ

সাধারণতঃ বাচ্চা ছেলেরা খেলার সামগ্রী, যথা—ফলের ছোট বিচি, গুলি, পেনসিলের টুকরো, বোতাম ইত্যাদি নাকে ঢুকিয়ে ফেলে। বেশী ভেতরে প্রবেশ করে গেলে সেটা নাকের গহ্বরে কোন খাঁজে আটকে যায়।

এসব ক্ষেত্রে খোঁচা-খুচি করে বার করবার কোন চেষ্টা করবেন না। রোগীকে নাক বন্ধ রেখে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলবেন এবং অনতিবিলম্বে মেডিক্যাল সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

অগ্নি বা আগুন নিরাপত্তা

মোটামুটি ভাবে এগুলোর সম্পর্কে অবহিত (জানা) থাকা প্রয়োজন।

রান্নার উনুন, ষ্টোভ, কেরোসিন তেল, দেশলাই, বিচালি, পুরানো আসবাবে ভরা

গুদাম ঘর, পূজার বাজী, এরা সবাই আগুনের উৎস হতে পারে।

বিভিন্ন দেশে দুর্ঘটনা অনুসন্ধান করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। জ্বলন্ত সিগারেটের অংশ, নিভন্ত দেশলাই কাঠি হয়তো হাজার বার ক্ষতি করে না। কিন্তু মাত্র একবারেই সে সজাগ হয়ে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করে দিতে পারে। দয়া করে জলন্ত সিগারেট, বিড়ির অংশ, নিভন্ত দেশলাই কাঠি যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করবেন না।

বাচ্চাদের দেশলাই জ্বালাতে দেবেন না, এটা তাদের বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে।

জল নিরাপত্তা ঃ

গ্রামের বাড়ীতে পিছল থাকলে স্নানের ঘাট সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে (যাতে

হঠাৎ পা ফসকে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যায়)।

এগুলো জল নিরাপত্তার অঙ্গ। পাঁক, আগাছা প্রভৃতি প্রতি বৎসর পরিষ্কার করলে দুর্ঘটনা কমিয়ে দিবে। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করে অথবা একান্ত বাস্তব প্রয়োজন হলে কম জলে খানিকটা ঘিরে নিয়ে সেখানে তাদের স্নানের অভ্যাস করানো যেতে পারে।

কুকুরের কামড়

সাধারণ পোষা কুকুরের কামড়ে বিশেষ কোন ভয় নেই। যদি না বুলডগের খাব-লানো কামড় হয়। রাস্তার নেড়ী কুকুরের আবর্জনা নোংরা স্বভাবের জন্য এদের কামড়ে খেপসিস ঘটাতে পারে। পাগলা কুকুর কাম-ড়ালে সেটা মারাত্মক। কারণ তাদের মুখের লালায় জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু থাকে।কুকুর,

নেকড়ে, শেয়াল, বেজী এরা সবাই পাগলা অবস্থায় এই জীবাণু ক্ষরণ করে।

কুকুরে কামড়ালে কতকগুলি সংবাদ নিতে হবে ঃ

১। কুকুর রাস্তার কি না।

২। তার পাগল হওয়ার কোনো লক্ষণ আছে কি না। যথা—কোপন স্বভাব, অবিরত আর্ত চিৎকার, জলাতঙ্ক, লাল ক্ষরণ, যাকে তাকে কামড়ানো ইত্যাদি। সাধরণতঃ ৮।১০ দিনের মধ্যে রোগগ্রস্থ জন্তুটির মৃত্যু হয়।

৩। দংশন স্থানে স্থানীয় চিকিৎসা করুন।

বিঃ দ্রঃ—মনে রাখবেন, পাগলা কুকুরের সামান্য অঁচড়ে ও জলাতঙ্ক রোগ ঘটতে পারে যদি কোনো মতে এই সব ক্ষত লালাকৃষ্ট হয়।

স্থানীয় চিকিৎসাঃ

কুকুরের বিষ সাপের বিষের মতো রক্ত চলা চলের পথে উঠে না। ওঠে নার্ভ পথে। তাই এক্ষেত্রে রক্ত চলাচল বন্ধকরা বন্ধনীর প্রশ্ন ওঠে না।

১। আহত অঙ্গকে নীচু রাখুন। আহত অঙ্গের রক্তপাত আছে কি না লক্ষ্য করুন, থাকলে তা বন্ধ করুন।

২। কারবোলিক সাবানের জল দিয়ে আহত স্থান ধুয়ে ফেলুন।

৩। যদি মেডিক্যাল সাহায্য অনতে সময় লাগে এবং কুকুর পাগল মনে হয়, তবে কার্বালক এ্যাসিড স্থানটিতে লাগিয়ে দিন।

(ক) প্রত্যেক ক্ষতের চারপাশে পরিষ্কার কাঠি দিয়ে প্রথমে ভেসিলিন লাগান। যাতে অক্ষত স্থানে এ্যাসিড পড়ে ক্ষত না করে।

(খ) কারবোলিক এ্যাসিডে কাঠি

ডুবিয়ে ঝেড়ে নিন। পরে ক্ষত স্থানে কাঠিটি ছুঁইয়ে দিন।

(গ) কুকুরের কামড়ে দুইটি দাঁতের জন্য অনেকগুলি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি ক্ষত স্থানে এমনিভাবে এ্যাসিড লাগাবেন।

(ঘ) কামড়ের পর আধ ঘণ্টার বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে এ্যাসিড লাগাবার প্রয়োজন নেই।

বিছা, মৌমাছি, ভোমরা ও ভীমরুলের কামড়

এদের কামড় মারাত্মক হতে পারে, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এরা হুল ফুটিয়ে বিষথলি থেকে হুলের পথে বিষ ঢেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে হুলটি ভেঙে গিয়ে দংশন স্থানে বিঁধে থাকে।

এদের বিষ আ্যাসিড জাতীয় মিশ্রণ। কারণ বিষগ্রন্থিতে জীবাণু আছে। আনুগতি

সবসময় ঠিক থাকে না। তাই লেবুর রস ব্যবহার হয়।

এসব ক্ষেত্রে কি করতে হবে ঃ

১। রোগীকে আশ্বাস দান এবং মেডিকেল সাহায্যে র ব্যবস্থা করা।

। যদি হুল ফুটে থাকে, তবে সেই হুলটি বের করে দিতে হবে। চিমটে দিয়ে তা সম্ভবপর নয়। কারণ এ দিয়ে ধরা মাত্র হুল ভেঙে যাবে। তাই গর্তওলা চাবি হুলের ওপর বসিয়ে চাপ দিন। যাতে চারপাশে চাবির চাপের ফলে হুলটি গর্তের মধ্য থেকে উঠে আসে। এবার হুলটি ধরে বের করে নিন।

সর্প ও সর্পাঘাত

সৃষ্টির দিন থেকে সাপ বাস করছে মানুষের চিন্তায়। জন্মেঞ্জয় করেছিলেন সর্পযজ্ঞ। সর্প নিধনের সেই মহাযজ্ঞে

আস্তিক মুনির আগমন সর্পকুলকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। তথাপি সাপের সঙ্গে মানুষের বিরোধ আজও মেটেনি। আমরা হেলায় সাপকে নাচাই সাপের মাথায় নাচি। মানুষ যতই সাপকে দূরে রাখতে চেয়েছে মানুষের রূপকথা ততই দান করেছে আশ্রয়, তার আলোছায় নিজ রাজ্য।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক পনেরো মিনিটে একজন সর্পাঘাতে মারা যাচ্ছে। তবু সকল সর্পাঘাতের সংখ্যা আমরা জানি না।

অসতর্ক মানুষ সর্পদষ্ট হয়? তাই দেখা গেছে অনেক জঙ্গলে এ্যাডভেঞ্চার করা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাদলের সর্পাঘাত ও মৃত্যুহার তুলনামূলক বিচারে অনেক কম। কারণ অভিযাত্রী সেনানীর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ সতর্কিত।

২

গর্ত খোঁচাতে গিয়ে, অন্ধকার পথ চলতে সাপের গায়ে বা লেজে পা দিয়ে, পুরানো ভগ্নস্তুপের আশেপাশে (যেখানে সাপ থাকতে ভালবাসে) গিয়ে পড়ল, এমনি নানা অসতর্ক কাজের ফলে সর্পাঘাত বেশী হয়।

তাই সর্পাঘাতের সাথে সাথে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন সাপের প্রকৃতি, স্বাভাবিক বাসস্থান এবং তাদের এড়াবার সহজ উপায়গুলো। আর ও জানা প্রয়োজন বিষধর ও নির্বিষ সাপ সনাক্ত করবার উপায়।

সাপের প্রকারভেদ ঃ

বাসস্থান ভেদে সাপ দু'রকম। জলচরী ও স্থলচরী। ভারতবর্ষেই আছে প্রায় ত্রিশ জাতের সাপ। এরা শতকরা ৯৯টিই বিষাক্ত। তবে এদের মুখ খুব ছোট বলে

এরা আমাদের ভালো করে কামড়াতে পারে না। কামড়ালেও বিষ ঢালতে পারে না। আর লেজ চ্যাপ্টা এবং বড় বলে এরা সাঁতার নাগালের বাইরে থাকে। সমুদ্রের উপকূলে, বাংলাদেশে, সুন্দরবনের খাঁড়ির মধ্যে এরা সাধারণতঃ বাস করে। তাই এদের নাম সামুদ্রিক সাপ। মিঠে জলে বা পুকুরে যে সাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারা অধিকাংশ কিন্তু ডাঙার সাপ এবং নির্বিষ।

ডাঙার বিষধর সাপের দুই প্রধান গোষ্ঠী।

১। কোবরা গোষ্ঠী। এরাই শতকরা নব্বইটি।

২। ভাইপার গোষ্ঠী। ভাইপারদের সকলেই বিষধর, তবে কোবরাদের কারো কারো নির্বিষ। বিষ নেই।

সাপ দেখতে কেমন ঃ

গোষ্ঠী ও জাতিভেদে সাপ নানা বৈচিত্র্য

নিয়ে পৃথিবীতে বাস করছে। কেউ বা মোটা ১৫।২০ ফুট লম্বা ! আবার কোন সাপ রঙের বৈচিত্র্যে যে কোন ছবিকেও হার মানাতে পারে। সাপের সারা শরীরে ছোট ছোট আঁশ দিয়ে ঢাকা, মাথার আঁশগুলো বড় হলে বলা হয় শীল্ড। চোখ দুটোও আঁশ দিয়ে ঢাকা। সাপ বছরে একবার খোলস বদল করে। কোন কারণে খোলস ত্যাগ করতে না পারিলে আঁশগুলো ক্রমশঃ শক্ত হয়ে দেহের সঙ্গে কামড়ে বসে যায়। যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর। জলের সাপ সব খোলস একসঙ্গে ছাড়ে না। অল্প অল্প করে ছাড়ে।

সাপের সমস্ত দেহে প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ লেজ। এই লেজের ভর দিয়ে সাপ ফণা তুলতে পারে।

সাপের মাথা গোল অথবা

ত্রিকোণাকৃতি। উঠে দাঁড়ালে কোন সাপের মাথা ও ঘাড়ের অংশ প্রমাণিত হয়। তাকে বলা হয় ফণা। অধিকাংশ ফণাধারী সাপ বিষধর।

সাপের চোখ পটলচেরা। চোখের ওপর আঁশ-এর যে আবরণী আছে-তা মাছের চোখের পর্দার মতোই। এ পর্দার ওঠা-নামার প্রয়োজন এবং সেরূপ ব্যবস্থা নেই। এই কারণে সাপ সজাগ দৃষ্টি নিয়েই গর্তে ঢুকতে পারে। তাই মনে হয় সাপের পলক পড়ে না।

সব সাপের দাঁত আছে। ওপরের চোয়াল অখণ্ড? নীচের চোয়াল লম্বালম্বি দু'খণ্ডে ভাগ করা। খাবার সময় প্রত্যেক খণ্ড চোয়াল যুগপৎ এগিয়ে পিছিয়ে খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। প্রত্যেক চোয়ালেই দাঁত থাকে। এসব

দাঁত ভেতর দিকে বাঁকানো। তাই কোন খাদ্য একবার মুখে প্রবেশ করালে আর বের করতে পারে না। "সাপের ছুঁচো গেলা" শুধু প্রবাদ নয়, বাস্তব সত্য। এই দাঁত ছাড়াও বিষধর সাপের আছে বিষদন্ত। কেবলমাত্র বিষধর সাপেরই বিষদন্ত থাকে।

সাধারণ দাঁত থেকে বিষদন্ত হয় বেশী লম্বা, সুচালো। কোনো কোনো সাপের বিষদন্ত ফোলা ও নালীকাটা, আবার কারও বিষদাঁত ইঞ্জেকশান সূচের মতো ছিদ্রমুখী।

সাপের ঘাড় সরু এবং কোন ধড় থাকে না। তাই গলার চেয়ে অনেক বড় আকারের বস্তু স্বচ্ছন্দে উদরে প্রবেশ করাতে পারে। অজগর সাপের ছয় ইঞ্চি ব্যাসের গলা দিয়ে তাই ছাগল, ভেড়া সবই পেটের মধ্যে গলে যায়।

সাপের ব্যবহার কেমন ?

বেশীরভাগ সাপ নিশাচর। বিষধর সাপ প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বিষধর সাপের কেউই অকারণে হিংস্র নয়। যা তাদের স্পর্শে সর্বদাই বলা হয়ে থাকে। মানুষ সাপের ভয়ে যতটা ভীত, সাপও মানুষকে ততটা এড়িয়ে চলে। যতক্ষণ না সাপ অনুভব করেছে সে আক্রান্ত হয়েছে, ততক্ষণ পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতেই ব্যস্ত থাকে। তবে আক্রান্ত হলে, যেমন লেজ মাড়িয়ে দিলে, বিদ্যুৎগতিতে বিষদাঁত বসিয়ে বিষ প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সাপের শ্রবণেন্দ্রিয় (কান) আছে। তবে তা দিয়ে শুনতে পায় না। কারণ কানে শব্দবাহক অংশটি থাকে না।

সাপের পেটের দু'পাশে যে আঁশগুলো আছে তা দিয়ে তারা সহজেই মাটির কম্পন অনুভব করতে পারে। আঁশ মারফত এই

কম্পন ক্ষমতা অনুভবের মাধ্যমেই তারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের (কনের) কাজ চলিয়ে নেয়।

তাই রাত্রে বা দিনে পথ চলার সময় পা বা লাঠি দিয়ে শব্দ করে চললে, অনেকদূর থেকেই মাটির বুকে কম্পন জাগে এবং সাপ তা অনুভব করতে পারে।

সাপের চোখের আবরণী, যা মুখ্যতঃ আঁশ দিয়ে তৈরী তীব্র আলো সহ্য করতে পারে না। তাই পথ চলবার সময় আলো হাতে চলা নিরাপদ। আলোর পথ ছেড়ে সাপ দূর থেকেই আপন বিবারের অন্ধকার চলে যায়।

সাপের জিভ লক্‌লক্ করে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, তা দিয়ে সাপ বাতাসী স্পন্দন অনুভব করতে পারে। তাই সজাগ হলে সাপ মুখ খুলে থাকে। সাপুড়ে বাঁশী বাজায়। বাঁশীর সুর শুনে সাপ তারই

তালে তালে ফণা দুলিয়ে নাচে। এ শুধু কল্পনা। সাপুড়ের বাঁশী সাপ শুনতে পায় না। সাপ শুধু তার সর্পিল চোখ দিয়ে অনুসরণ করে। সাপুড়ের হাতের আন্দোলিত বাঁশীটিকে এবং সেইসঙ্গে ফণা দোলায়।

বর্ষাকালে সাপের গর্তে জল ঢুকে পড়ায় তারা বাধ্য হয়ে শুকনো জায়গা অন্বেষণ করে। তাই বর্ষাকালে সাপ বেশী দেখা যায়। সাপ নিজে গর্ত ঢুকে জোড় সেখানে বাসা বাঁধে।

পোড়া বাড়ীতে, ভিতরে গর্তে বা ফোকরে, গাছের কোটরে এবং ডালে সাপ থাকে।

কার্বোলিক অ্যাসিডের তীব্র গন্ধ সাপ পছন্দ করে না। তাই বাড়ীর চারপাশে অ্যাসিড ছড়ালে সাপকে এড়ানো যায়।

সাপ শুকনো; আলগা, নুড়িওলা জমিতে চলতে পারে না। তাই বাড়ীর চারপাশে নুড়ির একটি বাঁধ বেশ নিরাপদ।

গিলছে কিন্তু খাচ্ছে না ঃ

একথা সাপের খাওয়া সম্পর্কে প্রযোজ্য। অন্যান্য জন্তু চিবিয়ে সাপ কিন্তু খায় না। মুখ খাদ্যের ওপরে আস্তে আস্তে সমস্ত গলাটাকে যেন গড়িয়ে নিয়ে আসে। হাতের ওপর জামার আস্তিন খোলবার মতো।

ব্যাঙ, ইঁদুর সব সাপের প্রিয় খাদ্য। এরা ধরা পড়লে এক ধরণের আর্ত আওয়াজ করে, সেই আওয়াজের সাথে পরিচিত থাকলে সাপের অস্তিত্ব বোঝা যায়।

সর্প দর্শন ঃ

সাপ কামড়ায় এবং কাটে।

বিষদাঁত ফুটিয়ে দিলে তাকে কাটা বলি।

তাই সাপে কাটা বিষধর সাপের পক্ষেই সম্ভবপর। সাপ মাত্রই কামড়াতে পারে, কারণ প্রত্যেক সাপেরই দাঁত আছে। সমুদ্রের সাপ বিষধর হলেও মুখ ছোট বলে সকলে কামড়াতে পারে, কিন্তু (কাটতে) পারে না অর্থাৎ বিষ ঢুকাতে পারে না।

বিষধর সাপের বিষদাঁত আহত অঙ্গে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। বিষদাঁতে গোড়ার থাকে বিষথলি। কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সাপ মাথাটা এলিয়ে মাংস পেশার চাপ লাগিয়ে বিষথলি উজাড় করে দেয়। একবার সম্পুর্ণ উজার হয়ে গেলে বিষথলি পূর্ণ হতে ২১ দিন সময় লাগে। তাই এই সময় দ্বিতীয়বার কামড়ালে বিষের মাত্রা কম থাকে বা থাকে না। বিষাক্ত সাপ কাটে সাধারণতঃ কামড়ায় না কোবরা সাপ কখনও বা কামড়ে ঝুলে থাকে তাড়াতাড়ি অনেক সময় বিষদাঁত ফোটাবার অবকাশ না পেলে আহত স্থান

ছড়া চিহ্ন থাকে।

ভাইপার বিষ সম্পুর্ণ ঢুকতে পারে। কিন্তু কোবরার অনেকখানি বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। সাপের বিষ জমে গিয়ে হলদে রং এর গঁদের মত আহত স্থান চিক্ চিক্ করতে থাকে।

অধিকাংশ সর্প দংশন নিম্নাঙ্গে হয়, বিশেষ করে হাঁটুর নিচে। একটা তিন ফুটের সাপ হলে, সে উঁচু হয়ে ফণা ধরতে পারে ছয় ফুট পর্যন্ত।

পায়ে পটি বাঁধা থাকলে, যেমন পুলিশেরা পরে অন্ততঃ ফুলপ্যাণ্ট পরা থাকলে সাপ সহজে কাটতে পারে না এবং কাটলেও সর্প বিষ বেশীর ভাগই দেহের ভিতর প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। বেশ কিছুটা পটিতে বা কাপড়ে লেগে যায়।

সাপ চেনা ঃ

সাপ চেনা প্রয়োজন। কারণ তার

ওপর নির্ভর করতে পারে কোন ঔষধ রোগীকে দিতে হবে। জীবন্ত সাপ চিনতে যাওয়া নিরাপদ নয়, তাছাড়া অনেক ভুলও হতে পারে।

আমরা জানি ফণাধারী, বিচিত্রিত সাপ বিষাক্ত অথচ ভাইপার ফণা নেই' যারা বিষধর সাপের শিরোমনি। সাপ বিষাক্ত কিনা সনাক্ত করতে হলে সাপকে মেরে ফেলুন এবং উলটে নিন যাতে তার পেট দেখা যায়। সাপ পেটের উপর হাঁটে এবং হাঁটার সময় যে দিকটি আমরা দেখতে পাই সেটা পিঠ। পেটের আশ মাত্রই আড়াআড়ি ভাবে সাজান

লক্ষ্য করুণ ঃ –

(ক) যখন দেখবেন আশগুলো বেশ বড়ো বড়ো তবে আড়াআড়ি ভাবে পেটের এপাশ থেকে ওপাশ সম্পুর্ণ ঢেকে ফেলেছে না এবং দুপাশে ছোট আশ দেখা যাচ্ছে

তখন জানবেন সাপটির বিষ নেই।

(খ) আর যদি আঁশগুলো পেটের সম্পূর্ণ অংশ এপাশ থেকে ওপাশ সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়, তবে সাপটার বিষ নেই অথবা বিষধর দুই-ই হতে পারে।

(গ) মাথার আশগুলো ছোট ছোট হলে জানবেন সাপটি বিষধর এবং কোনো ভাইপার গোষ্ঠী।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিষাক্ত সাপ ও তাদের পরিচিতি

নাম	কোথায় পাওয়া যায়	চেনার উপায়
১। কোবরা বা গোখরা	সর্বত্র লোকালয় ভালবাসে	(ক) সাপ লম্বায় ৪-৬ ফুট (খ) সাধারণতঃ কালো বা কটা রঙের হয়। (গ) ফণা থাকে এবং ফণা ধারণ করলে

		গোক্ষুরের মতো চিহ্ন পাওয়া যায়।
২। সর্পরাজ বা নাগরাজ বা শঙ্খচুড়	জঙ্গলে বা জঙ্গলের কাছাকাছি এলাকায় এদের বেশী দেখা যায়।	(ক) লম্বায় ১০-১২ ফুট অথবা বেশী। (খ) নানা রংয়ের হয়। হলদে, তামাটে বা কালো। (গ) ফণার কোন চিহ্ন
৩। বোড়া বা চন্দ্রবোড়া	সর্বত্র পাওয়া যায় তবে গভীর জঙ্গলে নয় সাধারণত সমতল জায়গা পছন্দ করে। ধান ক্ষেতের আলে গর্ত বড়ো প্রিয়।	(ক) মজবুত দেহ ৪ ৫ ফুট লম্বা। (খ) কটা. তামাটে রং। (গ) পিটের ওপর গোল গোল বা ছকোণা কালো ছোপ থাকে। (ঘ) ভারী ত্রিকোণ মাথা ফণা নেই।

৪। করাইত সর্বত্রই বিশেষ করে (ক) লম্বায়
বীরভূম জেলার ৩-৪ ফুট।
শুকনো অঞ্চলে (খ) চক্ চকে কালো
পাওয়া যায়। রংয়ের দেহ।
বাড়ীতে বা (গ) ঘাড়ের কিছু পর থেকে
বাড়ীর আশে আড়াআড়ি ভাবে সাদা
পাশে থাকতে ডোরা দাগ থাকে।
ভালবাসে।

কোবরা এবং করাইত সাপের কামড় ঃ

১। অল্পক্ষণেই দংশন স্থানের যন্ত্রণা কমে যায়।

। সে জায়গা অসাড় হয়ে পড়ে।

৩। ক্রমশঃ অসাড় ভাগ ওপরে মাথার দকে উঠতে থাকে।

৪। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হতে থাকে।

৫। দংশন স্থানে সামান্য ফোলা ছাড়া কিছু থাকে না।

ভাইপার সাপের কামড়

১। যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়ে।

২। চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়তে থাকে। কারণ লাল কণিকাগুলো বিষক্রিয়ার ফলে ভেঙে যায়।

৩। আহত স্থান কাটলে সেই রক্ত লাল জেলীর মতো পড়তে থাকে।

সাপ কামড়ালে দুসমন সাপকে মেরে ফেলার যে রীতি চালু আছে তার প্রয়োজন আছে। কারণ সেই সাপকে দেখে মেডিক্যাল চিকিৎসা ঠিক করা সহজ হতে পারে কোন প্রতিষেধক রোগীকে দেওয়া হবে।

একটি সাপে কাটার প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা ঃ

১। রোগীকে শায়িত রাখবেন যথা সম্ভব কম নাড়াচাড়া করবেন।

২। আহত স্থান বন্ধনী যোগ্য হয় সবার আগে বন্ধনীর ব্যবস্থা করবেন। লক্ষ্য রাখবে ধ্রুরন্ত নাড়ী যেন বন্ধ হয়ে না যায়।

৩। আহত অংশে বন্ধনী রক্ত সঞ্চালন বন্ধ না করা পর্যন্ত রোগীকে বিশেষ নাড়া-চাড়া করবেন না।

৪। আহত স্থান এক কেঠলিক সাবান জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।

৫। ছুরি বা ব্লেড দিয়ে বিষদাঁত কাটার চিহ্নের ওপর ক্রশ চিহ্নের আকারে কেটে দিন।

৬। অল্প গরম জল দিয়ে আহত স্থান ধুতে থাকবেন। এতে রক্ত বেরোতে থাকবে।

৭। এই অবস্থায় রোগীকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে।

৮। শরীর হতে বিষটি বের করবার প্রয়োজন হলে আহত স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষে সে রক্ত বের করে দিতে হবে। দাঁত বা মাড়ি বা জিভে ক্ষত থাকলে খুবই বিপজ্জনক।

৯। প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর বন্ধনীকে অল্প আগল করে আগল করে দিবেন যাতে নাড়ী কয়েক মুহূর্তের জন্য ফিরে আসে।

১০। যে সব ক্ষেত্রে বন্ধনী প্রয়োগ করা যায় না সেখানে ভাচুপম প্রক্রিয়ার রক্ত ক্ষরণ চালু রাখবেন।

১১। মেডিক্যাল সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন।

মনে রাখবেন ঃ—

১। যত লোকে সাপের বিষে মরে তার চেয়েও বেশী মরে সাপের আতঙ্কে।

২। বন্ধনী না বাঁধা পর্যন্ত রোগীকে নাড়াবেন না।

৩। চুষে রক্ত বের করানোর পদ্ধতি ভাল।

৪। সাপের বিষের একমাত্র প্রতিষেধক এ্যাণ্টিভেলিন যা মেডিক্যাল সাহায্যের আওতায় পড়ে।

জলে ডোবা ও গলায় দড়িতে ঝোলা

১। জলে ডোবা ঃ সর্বাগ্রে মুখ পরিস্কার করুন ; কৃত্রিম শ্বাস চালান। ভেজা

কাপড়, জামা খোলা, অন্য ক্ষতের চিকিৎসা করা।

২। গলায় দড়িতে ঝোলা ঃ হঠাৎ সেই মুহূর্তে দেখা সম্ভবপর হলে তৎক্ষণাৎ রোগীর সাহায্যে অগ্রসর হওয়া চিৎকার করে লোক জড়ো করা আর সেই সংগে রোগীর পা দুটি পাকড়ে উঁচু করে তুলে ধরে গলায় ফাঁস আলগা করবার চেষ্টা করা যতক্ষণ না সাহায্যকারী এসে ফাঁসের দড়ি কেটে রোগীকে মুক্ত করে।

৩। গলায় ফাঁস লাগা ঃ—তৎক্ষণাৎ ফাঁস কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৪। শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া ঃ— শ্বাসনালী মুক্ত করার চেষ্টা করা। রোগীকে উপুড় করে পায়ের দিক উঁচু করে শুইয়ে দিন। ঘাড় মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে দিতে

হবে। ছোট ছেলে হলে পা ধরে ঝুলিয়ে দিন। পিঠের দুটো পাখনার মাঝে জোরে টোকা মারতে থাকবেন এবং গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করবেন।

মনে রাখবেন ঃ—বমি করানোর সময় দিকে থাকে।

স্নায়বিক আঘাত বা শক্ খাওয়া

আনেষ্মিক দুর্ঘটনা বহুভাবে ঘটাতে পারে। এই দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক সমগ স্নায়ু মণ্ডলীর উপর হঠাৎ যে অপকর্ষ উপস্থিত হয়, তাকে শক্ অর্থাৎ স্নায়বিক আঘাত বলে। অল্প অল্প মুর্ছাভাব থেকে আরম্ভ করে এই অবস্থা ক্রমে অবসন্ন ভাবে

পরিণত হতে পারে। এই অবসন্ন ভাব অবস্থায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের স্নায়বিক আঘাত লাগতে পরে, যেমন—

(১) স্নায়ুজনিত, (২) রক্তস্রাব জনিত ও (৩) বিষজনিত।

শ্নায়ুজনিত আঘাত (নার্ভ শক্) ঃ

স্নায়ুজনিত আঘাতের কাজ দ্রুত শুরু হয় এবং মূর্চ্ছাভাব থেকে রোগী ক্রমে সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়তে পারে।

এই ধাক্কায় রক্তের চাপ হঠাৎ হ্রাস পায়, ফলে মাথায় উপযুক্ত পরিমাণ রক্তাভাব ঘটে।

চিহ্ন ও লক্ষণ ঃ

(১) মুখ ও চামড়া ঠাণ্ডা, পাণ্ডুর হয়।

(২) মুখ ও চাওড় আটাযুক্ত হয়।

(৩) নাড়ী গতি ক্ষীণ থাকে। প্রথন অবস্থায় নাড়ীর গতি মৃদু থাকে কিন্তু পরে তা দ্রত হয় এবং কজীতে তা অনুভব করা যায়।

(৪) সুষ্ঠ বা স্বাভাবিক শ্বাস -প্রশ্বাস ক্রিয়া অনুষ্টীত হয় না।

(৫) চোখের তারা সাধারণতঃ বড় হয়।

(৬) শারীক দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

(৭) অচৈতন্য হতে পারে, অচৈতন্য না হলে মাথা ঘুরতে পারে। এই অবস্থায় ধাক্কা লাগলে বা অচৈতন্য অবস্থা থেকে চেতনা ফিরে এলেও দেখা দিতে পারে।

রক্তস্রাবজনিত আঘাত ঃ

প্রচুর রক্তপাত ঘটলে রোগীর স্নায়ু জনিক আঘাতও কিছু দেখা দিতে পারে।

চিহ্ন ও আঘাত ঃ

(১) মুখ পাণ্ডুর য়,হ চামড়া ঠাণ্ডা হয় এবং আটাযুক্ত হয়। ঠোঁট ও আঙ্গুলের গোড়া নীলবর্ণ হয়ে যায়।

(২) নাড়ির গতি দ্রুত ও ক্ষীণ হয়।

(৩) শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়। রক্তপাত প্রচুর হলে রোগী নিশ্বাসে প্রচুর বায়ু নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

(৪) চঞ্চলতা বাড়তে পারে ; অনর্গল কথা বলার ইচ্ছা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দের ভাব হয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই অজ্ঞানতা আসতে পারে।

(৫) ব্যথায় অনুভূতি থাকে না বললেই চলে। কিন্তু ব্যথা উঠলে রোগীর বমির ভাবের উদ্রেক হয়।

(৬) তৃষ্ণা পেতে পারে, বেশী পানীয় গ্রহণ করলে বমি হতে পারে।

বিষজনিত আঘাত ঃ

রক্তে বিষাক্ত দ্রব্য প্রবেশ করে এই ধাক্কার সৃষ্টি করে। এই বিষ সাধারণতঃ গুরুভার দ্বারা পিষ্ট হয়, বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতি এবং পোড়া হাড়ভাঙ্গা দ্বারা গুরুতর আঘাত এলে বিষজনিত আঘাত দেখা দেয়।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ

(১) মুখ ও শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা, পাংশু ও আটাযুক্ত হয়। কপালে ঘাম দেখা দেয়। মুখ নীলবর্ণ হয়ে যায়। প্রথমে ঠোঁট, ক্রমে কান ও আঙ্গুলের গোড়া নীল হয়ে যায়।

(২) নাড়ীর গতি দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। কব্জীতে নাড়ীর গতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিষজনিত ধাক্কার ক্ষেত্রে নাড়ীর গতিতে মিনিটে ১০০ হতে পারে।

(৩) শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে থাকে ; শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

(৪) ঠোঁট ও মুখমণ্ডল শুকিয়ে যায় এবং জিভে ময়লা দেখা দেয়।

(৫) চাউনীতে শূন্যতা দেখা দেয়; চোখের তারা বড় হয়।

(৬) সাধারণতঃ দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে অচৈতন্য অবস্থায় মাথা ঘোরা ও বমির ভাব দেখা যায়।

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা

১। রক্তপাত হতে থাকলে সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সংগে তা বন্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে।

২। রোগীকে কম্বলের উপর শুইয়ে এবং শরীরের আহত অংশটা কোন আশ্রয়ের উপর রাখবে। মাথাটা একটু নীচু রাখবে এবং একপাশে কাত করে দেবে।

৩। ঘাড়, বুক এবং কোমরের কাপড় হালকা করে দেবে।

৪। চারপাশে ভীড় না করে রোগীকে

মুক্ত বাতাসে রাখতে হবে যাতে রোগী সহজে শ্বাস নিতে পারে।

৫। আঘাতের স্থানে যন্ত্রণা বাড়ে এমন কোন ব্যবস্থা নেবে না।

৬। শরীরকে গরম রাখবার জন্য শরিরকে কম্বল কিংবা কোট দিয়ে ঢেকে দেবে।

৭। শরিরের নিম্নাংশ উঁচু করে রাখবে।

৮। মাথায় আঘাত না থাকলে স্মেলিং সল্‌ট ব্যবহার করতে পার।

৯। রোগিকে উৎসাহ দিবে।

১০। যাতে তার মানসিক উদ্বেগ বাড়ে বা ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায় এমন কোন কাজ করতে নেই।

১১। রোগির অবস্থা নিয়ে কোন আলোচনা যেন রোগির কানে না যায় এমন

ভাবে কথাবার্তা বলতে হয়।

১২। যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে কোন আচ্ছাদিত স্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

আশ্রয়ে উপস্থিত হবার পর চিকিৎসা ঃ—

১। রোগিকে কম্বলে মুড়ে শরিরের পাশে, সারা পা চেটো পর্যন্ত গরম জলের বোতলে সেক দিতে হবে।

২। রোগির গলা দিয়ে যদি খাবার নামে তাহলে তা গরম চা বা কফি পান করানো যেতে পারে। অবশ্য তাতে চিনির পরিমাণ বেশী হবে।

৩। রোগির আহত স্থান বেশি নাড়া-চাড়া না করে দেখে তার প্রতিবিধান করতে হবে এর জন্য মেডিক্যাল সাহায্য নেবে।

বৈদ্যুতিক আঘাত (ইলেকট্রিক শক্)

আজকাল বিদ্যুৎ আমাদের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন— রন্ধন কাজে,

আলোর কাজে, নানা কলকজা চালাতে ইত্যাদি। এই বিদ্যুৎ ব্যবহার কালে অনেক সময় অসাবধান- বশতঃ শক লাগতে পারে। এই শক্ লাগলে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। নচেৎ বিদ্যুৎপিষ্ঠ ব্যকতি থেকে সাহায্যকারী ব্যক্তি ও আক্রমিত হতে পারে। সর্বপ্রথম সাহায্যকার সাহায্যের পূর্বে নীচে লেখা সাবধানতাগুলি অবলম্বন করিবেন, যেমন—

সর্বপ্রথম সুইচ বন্ধ করে তবে বিদ্যুৎপিষ্ঠ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করতে হবে।

(১) সম্ভব হলে সাহায্যকারী ব্যক্তি ইণ্ডিয়া রবার, কাঁচ, লিনোলিয়াম অথবা অন্য প্রকার অধুতু যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে না বা তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেয় তার ওপর দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করবেন।

(২) রবারের দস্তানা বা তামাক রাখবার থলি, ম্যাকিণ্টস্ বা অন্য কোন রকম শুকনো বস্ত্র ব্যবহার করে নিজের হাতকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন।

(৩) আত্মরক্ষার জন্য কাছে পিঠে কিছু না পাওয়া গেলে শুকনো দড়ির ফাঁস দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সরবার চেষ্টা করবেন।

(৪) কখনও ছাতা দিয়ে বিদ্যুৎ পিষ্ঠ ব্যক্তিকে সরাতে যাবেন না। কারণ ছাতার শিক যে ধাতু দ্বারা তৈরী তা দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হয়ে সাহায্যকারীও আক্রান্ত হতে পারে।

(৫) অনাবৃত হাত দিয়ে রোগী কখনও আক্রান্ত ব্যক্তির চাপড়া, পরিহিত ভিজে কাপড় বা জুতা স্পর্শ করবেন না।

(৬) বগলের কাপড় প্রায়ই ভিজে থাকে। তাই কখনও আক্রা ব্যক্তির বগলে হাত দেবেন না।

সমস্ত রকম বৈদ্যুতিক আঘাতের চিকিৎসা ঃ

শক লাগলে রোগির শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া

সমস্ত রকম বৈদ্যুতিক আঘাতের চিকিৎসাঃ

শক লাগলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে কালক্ষেপ না করে রোগীর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলনা করতে চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য বহুক্ষণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই ক্রিয়া চালাতে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে শক খুব বেশী হলে দাহ উপস্থিত হয়।

শক কম বা বেশী যা হোক না কোন ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন প্রকার শাররিক বা মানসিক কাজে প্রবৃত্ত হবেন না।

—০—